দৈনিক খবর

তারিখ ...20 APR 1988..
পৃষ্ঠা... ... ...7 কলাম ..3...

..00 038

বাস্তবধর্মী শিক্ষা নীতি

।। আবুল হোসেন মিয়া ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের শিক্ষকদেরকে এই ছেলেমেয়েদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সপ্তম শ্রেণী পাস করিবার পর এই সমস্ত ছেলেমেয়েদেরকে ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার জন্য চিহ্নিত করিতে হইবে। এই ছেলেমেয়েরাই সাধারণতঃ তাহাদের জীবনে লিডার হইতে চায়। চাকুরী জীবনে তাহারা হইতে চায় ম্যানেজার, ডাইরেক্টর, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজনৈতিক জীবনে যখন তাহারা থাকে তখন তাহারা হয় জনগণের নেতা। সুতরাং দেখা যাইতেছে উন্নত দেশগুলিতে নেতা দুই প্রকার। (১) পেশাজীবী নেতা (২) রাজনৈতিক বা জনগণের নেতা। এখন কথা হইল পেশাজীবী নেতাদের লইয়া আমাদের কোন সমস্যা নয়, কারণ তাহাদের যার যার পেশায় তাহারা যদি উচ্চ শিক্ষা অর্জন করিতে পারে তবে তাহারা অবশ্যই ভবিষ্যতে মিল, কারখানা ও অফিস-আদালতে নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গা দখল করিতে পারে। আমাদের সমস্যা হইল সমাজ সেবক বা জনগণের নেতা বা রাজনৈতিক নেতাদের লইয়া।

রাজনৈতিক নেতাদের বাস্তবধর্মী শিক্ষা পদ্ধতি আলোচনার আগে নেতা বা নেতৃত্ব ব্যাপারে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি ঘটনা আমি এখানে তুলিয়া ধরিতেছি। আমি হল্যাণ্ডে থাকাকালীন সময়ে মিস্টার সিমসন নামক একজন নামকরা উকিলের সহিত আমার পরিচয় হয় ও অল্পদিনের মধ্যেই আমরা একটু ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছে যাই। মিস্টার সিমসনও মাঝে মাঝেই নানা ব্যাপারে আমার । সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে পছন্দ করিতেন। সিমসনের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল বিকম, এলএলবি এবং আমি আবুল হোসেন মিয়াও একজন বিকম, এলএলবি। যদিও সিমসন ছিল নেদারল্যাণ্ড-এর রাজধানী হেগ-এর 'ইউনাইটেড নেশান কোর্ট অব জাসটিস-এর একজন পেশাধারী উকিল আর আমি ছিলাম বাংলাদেশ সরকারের আমস্টার্ডাম অফিসের একজন সাধারণ কেরানী। আসমান আর জমিন তফাৎ। তাই না ? সিমসন কিন্তু তাহা বুঝিত না। সে আমাকে তাহার সমকক্ষই মনে করিত। একবার কথাচ্ছলে আমি মিস্টার সিমসনকে একটু আক্রমণাত্মকভাবেই বলিলাম— 'দেখ মিস্টার সিমসন, তোমরা ডাচ জাতিটা একটা বেকুব জাতি এবং বোকার হদ্দ। কারণ তোমাদের ভুল নীতির ফলে তোমাদের দেশে ম্যাট্রিক পাস করার পর খুব কম লোকই কলেজ-এ ভর্তি হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে দেখ যাহারা ম্যাট্রিক পাস করে তাহারা অধিকাংশই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিয়া বিএ, এমএ, পাস করে এবং এমনকি অনেক পিএইচডি পর্যন্ত পাস করে। আর তোমাদের এই ভুলশ্রম নীতিটা হইল এই যে, তোমরা বয়সের হিসাবে বেতন দাও। পদ মর্যাদার উপর নির্ভর করিয়া তোমাদের কোন বেতন কাঠামো নাই। তোমাদের একটা লোক ত্রিশ বছর বয়সে কোন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লইয়া চাকুরীর জন্য আসিলে তাহাকে তোমরা ডাইরেক্টরের পদে নিয়োগপত্র দাও। কিন্তু যদিও যে কাজের জন্য তাহাকে চাকুরীটা দাও সেই কাজের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার অতীতের শিক্ষা জীবন ছিল। তথাপি তাহাকে আরও তিন বছর তোমরা 'অনদি জব ট্রেনিং'-এ রাখ এবং শেষতক তাহাকে যখন সত্যিকারে পরিচালকের পদে বহাল কর তখন তাহার বয়স হয় ৩৩ বছর এবং তাহাকে বেতন দাও তিন হাজার গিলডার্ড। কিন্তু এই পরিচালকের অধীনেই এমন একজন অফিস ক্লিনার (ওখানে পিওন বলিতে কিছু নাই) আছে যাহার বয়স ৪৫ বছর, সে বেতন পাইতেছে ৪,২০০/- গিলডার্স। একটা ম্যাট্রিক পাস ক্লিনার যদি বয়স বেশীর অজুহাতে একজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ডাইরেক্টরের চাইতে বারশ' গিলডার্স বেশী বেতন পায় তবে আর মানুষ কষ্ট করে বা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিএ, এমএ, বা ডক্টরেট পাস করিবে কেন ? আমার এই আক্রমণাত্মক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ সিমসন যাহা বলিল তাহার সারাংশ আমি নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, যাহাতে পাঠক নিজেরাই বুঝিতে পারেন যে আসলে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ।

'মিঃ হোসেন আপনি যেদিন প্রথম দিন আপনাদের আমস্টারডাম অফিসে যোগদান করিয়াছিলেন সেদিন আপনার উক্ত অফিসে মাত্র দুইজন লোকের সংগে পরিচয় হয় আর তাহারা হইল আপনার বাংলাদেশী বস ও তাহার বাংগালী ড্রাইভার। তাহার পর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আপনাদের অফিস-এর আর তিনটি ডাচ্ মেয়ের সহিত পরিচয় হইল। তারপর মাসেকখানিক-এর মধ্যেই আরও বাংলাদেশ, ডাচ, ইংলিশ ও জার্মান এবং আরও অনেক নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধবের সহিত আপনার পরিচয় বাড়িয়া গেল। আর যতই আপনার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বাড়িতে থাকিল ততই আপনার ব্যক্তিগত খরচও বাড়িয়া চলিল। হইতে পারে যে, আপনার বন্ধুরা যখন আপনার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসে তখন তাহাদের অধিকাংশকে কোন কিছুর দ্বারা আপ্যায়ন করেন না। কিন্তু আপনার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাহাদেরকে কিছু না কিছু দ্বারা আপ্যায়ন করিতেই হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে আপনি যত বেশী দিন হল্যাণ্ড-এ থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত আপনার ব্যক্তিগত খরচ বাড়িতেই থাকিবে। এবং এই ব্যয়টা যে শুধু বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে তাই নয় অনেক দিক দিয়েই হয়ে থাকে, যেমন— আপনি যখন কোন নূতন দর্শনীয় জায়গার কথা জানিতে পারিবেন জায়গাগুলি দেখার জন্য আপনার টাকার প্রয়োজন হইবে। এমনকি আরো নানা কিছু। সেইরূপ একটা মানুষের জীবনেও বয়স বাড়ার সংগে সংগে তাহার খরচ বাড়িয়ে যায়। তাহার নিজস্ব ছেলেমেয়ে না থাকিলেও সমাজের ছেলেমেয়েরা প্রবীণ হিসাবে নানা কারণে নানাভাবে একটা বয়স্ক লোকের সঠিক ও সৎ পরামর্শের জন্য তাহার নিকট আসিয়া থাকে যাহার ফলে একটা লোকের বয়স বাড়ার সংগে সংগে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে খরচ বাড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া, একটি প্রবীণ লোকের নূতনদের চাইতে কর্মদক্ষতা বেশী। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে নূতনদের কর্মদক্ষতা বেশী হইলেও হইতে পারে কিন্তু কর্মদক্ষতা সব সময় প্রবীণদের মধ্যেই বেশী। আমাদের দেশে (মানে হল্যাণ্ডে) দেখা গিয়াছে যে, একটা ঘরকুনো বুড়োও অন্ততঃপক্ষে হাজার খানিক নব যুবকের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। তেমনি অফিস-আদালতে ও মিল-ফ্যাক্টরীগুলিতে নব যুবকদের কর্ম দক্ষতা বাড়ানোর জন্যও প্রবীণদেরই প্রয়োজন। কাজেই যাহারা প্রবীণ তাহাদের ব্যক্তিগত খরচও বেশী, আর সেই ব্যয়টার নূন্যতম অংশও যদি আমরা তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে তাহাদিগকে না দেই তবে তাহারা নিজেরাই দুশ্চরিত্র হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। আর আমাদের একটা বয়স্ক লোক চরিত্রহীন হওয়ার মানে হইল আমাদের হাজার খানেক ভবিষ্যতের নাগরিক চরিত্রহীন হইয়া যাওয়া, সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ মিঃ হোসেন আমরা একটা প্রবীণ লোকের সামান্য কয়টা পয়সার বিনিময়ে এই দেশের হাজার খানিক নব যুবককে চরিত্রহীন বানাইতে পারি না। আমাদের দেশে প্রতিটি বয়োবৃদ্ধ লোক আমাদের যুবক শ্রেণীর জন্য এক একটা স্কুল বা চরিত্র শেখার আসর। সেই বয়োবৃদ্ধ লোকদের যদি আমরা আর্থিক সমস্যায় রাখি তবে আমাদের যুব সমাজের চরিত্র গঠনের সুযোগ-সুবিধা কোথায় ? এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, একটা অফিস ক্লিনার ও একজন ডাইরেক্টর এই দুইজনের মধ্যে স্টেটাস্-এর পার্থক্য অনেক বেশী তাহা হইলে একটা অফিস ক্লিনারকে বেতন বেশী দেওয়াতে লাভটা কোথায় ? সে প্রশ্নের উত্তর হইল হল্যাণ্ডে মানবতা উন্নয়নমূলক কাজ হইল সমাজভিত্তিক। মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত (ওখানে কোন গরীব শ্রেণী নাই) বা ধনিক শ্রেণী-এর কোন একটা শ্রেণীতেই আমরা অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল লোক আশা করি না। যাহার দ্বারা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী রাজনীতিবিদ নীতি ধর্মহীন লোকের সৃষ্টি হইতে পারে।

— অসমাপ্ত